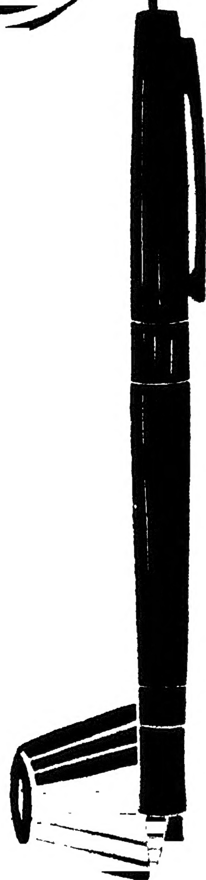


আধুনিক মণিপুরী কবিতার অনুবাদগুচ্ছ

অনুবাদক :

খৈর উদ্দিন চৌধুরী

ও

শোগাইজম ব্রজেশ্বর সিংহ

আধুনিক
মণিপুরী কবিতার
অনুবাদগুচ্ছ

১৯৭৭ ইং

প্রচ্ছদশিল্পী : মুকুন্দ দেবনাথ।

প্রকাশক : শ্রীইরুঙবম চন্দ্র সিংহ
সম্পাদক, নোংপোক্ মৈরা, শিলচর।

মুদ্রণ : শ্রীকমলেন্দু ভট্টাচার্য্য
শপথ মুদ্রণিকা, শ্যামাপ্রসাদ রোড, শিলচর।

বাঁধাই : হিন্দুস্থান ষ্টোর্স
শিলংপট্টি, শিলচর।

মূল্য : তিন টাকা।

The poets who encouraged us from Manipur deserves heart-felt thanks from the translators of this book.

—ঃ সূচীপত্র ঃ—

আধুনিক মনিপুরী সাহিত্যে কবিতা।

উত্তর ভারতের আলো বাতাসে সমৃদ্ধ বাংলা, অসমীয়া, হিন্দি. উর্দূ প্রভৃতি সাহিত্যের সঙ্গে সাহিত্য প্রিয় ভারতবাসীর পরিচয় সাহিত্যের ইতিহাসে পুরানো বললেও চলে। কালিদাস থেকে রবীন্দ্রনাথ ; নজরুল থেকে জীবনানন্দ: গালিব: ইকবাল থেকে শাহীর লুধিয়ানী: প্রেমচাঁদ থেকে বচ্চন. দেব বরুয়া, হেম বরুয়া থেকে যোরহাট জে. বি কলেজের অসমীয়া বিভাগের প্রধান সৈয়দ সাহেবের অমর লেখনী থেকে নিঃসৃত সুধা আকণ্ঠ পান করে আলস্য ভরে নন্দিনী সাত পাখীর দৃপ্ত কণ্ঠের সমাজবাদ ধ্বনিত লেখনীর দিকে কখনও চোখ ফিরিয়ে থাকেন। উত্তর ভারতের এই অমর সাহিত্য গোষ্ঠীর ভাষা থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ভারতের তাব একটি সাহিত্য লোক চক্ষুর অন্তরালে ধীরে ধীরে বিকশিত হয়েছিল, তার খবর আমরা খুব কমই রেখেছি বা আদৌ রাখিনি। সম্প্রতি কুঞ্জ মোহন, মহারাজ কুমারী বিনোদিনী, পাচা প্রভৃতি সাহিত্য জগতের একাডেমী পুরস্কার লাভ করে মনিপুরী সাহিত্যকে ভারতীয় সাহিত্য সমাজে এক অভিনব আসন দান করেছেন। এই নমস্য সাহিত্যিকদের অক্লান্ত শ্রম ও সাধনার কথা ভবিষ্যৎ মনিপুরী সাহিত্য শ্রদ্ধার সহিত স্মরণ করবে। আজ মনিপুরী সাহিত্য নিজস্ব বৈচিত্র ও স্বকীয় রূপ নিয়ে ভারতীয় সাহিত্য জগতে নিজের পরিচয় দিতে সক্ষম। গতকালের হামাগুড়ি দেওয়া এক সাহিত্যের এই সাফল্য অর্জন সত্যই গৌরবের যোগ্য।

দুই

প্রাকৃতিক পরিবেশে, সামাজিক অবস্থানে, ও ঋতু বৈশিষ্টের দিক থেকে মনিপুর এক ঐতিহ্য মণ্ডিত প্রদেশ। ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে বৃটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত বীর টিকেন্দ্রজিতের এই মনিময় দেশ— মনিপুর, ১৯৪১ খৃষ্টাব্দে বৃটিশ কুক্ষিমুক্ত হয়ে ১৯৪৮ খৃষ্টাব্দে সর্দার পেটেলের কেন্দ্রীকরণ নীতির ফলে শিলং এর সাক্ষাৎকারে মনিপুরের মহারাজ বুদ্ধচন্দ্র সিংহ ভারতীয় কেন্দ্রে যোগদানের স্বাক্ষর করেন। সেই দিন থেকে মনিপুর ভারতের অঙ্গরাজ্য। অঙ্গরাজ্য হিসাবে মনিপুরের শিক্ষা ও সংস্কৃতি সর্ব্বভারতীয় ধারায় প্রবাহিত হতে থাকে। ভারত এক বিচিত্র দেশ। ভিন্নতার মধ্যে ঐক্যই এই দেশের বৈশিষ্ট। মনিপুর ভাষায়, [illegible] স্বভাবে, রীতি-নীতিতে ভিন্ন হয়ে ও এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে লীন হয়েই রইল। ভিন্ন ফুলের মালার মাঝে একটি মালিকা হয়ে নিজেকে বিলিয়ে দিল জনগন মন ভাগ্য বিধাতার কাছে দেশ [illegible]র কাছে।

চতুর্দ্দিক থেকে নী[illegible] পাহাড় ঘেরা, লোকতাক হ্রদ শোভিত কাবুলিয়া গাছের ঋজুতা সমৃদ্ধ, হাসি-খুশী প্রিয় মনিপুরী জাতির এই দেশ ভারতের পুর্ব সীমান্তে অবস্থিত। সূর্য্যের কনক আভা এই উপমহাদেশে সর্ব প্রথম এই প্রদেশেই পৌঁছায়। এখানে হিন্দু, মসলিম নাগা কুকীরা ভাই-ভাইয়ের মত বাস করে। এখানে সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের আলিমুদ্দিন, সাইজারা ও [illegible] মন্ত্রী [illegible]। ধর্ম্ম [illegible]পেক্ষ, বহু সম্প্রাদায় সম্মিলিত ভারতবর্ষের একটি ক্ষুদ্র সংস্করন এই প্রদেশ। এখানে দে[illegible] পাখীরা, নেচে বেড়ায় কা[illegible]লিয়ার ডালে [illegible], সরোবর গুলিতে ভ্রমর গুঞ্জরণ করে পদ্ম ফুলের কানে কানে, পথে ঘাটে যেখানে সেখানে রংবেরং এর ফুলের ছড়াছড়ি। হাসি-খুশীপ্রিয় সরল জনতার প্রিয় নাট্যকার জে, সি, তোংব্রার হাস্য কৌতুক ভরা নাট্যাভিনয় হয় গ্রামে-গঞ্জে, শহরের গলিতে, পথে ঘাটে। প্রানের মেলা যেন সর্বত্রই। এই মনিপুরী জাতির সাহিত্যের বয়স ঐতিহাসিকরা নির্দ্ধারিত

করুন। আমি শুধু আজ তাদের প্রানের প্রাচুর্য্যকেই দেখব সাহিত্যের মুকুরে এবং তা ও প্রানের ভাষা কবিতার মাধ্যমে। কবিতা প্রাণের না বলা কথা ; মরমের গাথা। আমার বক্তব্য শুধু আধুনিক মনিপুরী মানষকেই কেন্দ্র করে। মনিপুরী কবিতার অতীত যুগের সহিত আমার পরিচয়ের ঘনিষ্ঠতা হইতে আধুনিক যুগের সহিত আমার পরিচয়কে ঘনিষ্টতর বলতে হয় বইকি।

গত বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে মানব জীবনের মূল্যবোধ ও তার ধ্যান ধারনায় আশা ভরসায়, আদর্শ ও দর্শনে এক বৈপ্লবিক পরিবর্ত্তনের হাওয়া বইতে আরম্ভ করেছিল। তার প্রভাব সামাজিক, অর্থনৈতিক, নৈতিক এমন কি ধর্ম্মবোধে এক বিপ্লবের দুবার খালে দিয়েছিল। প্রয়োজনীয় জিনিসের মূল্য বৃদ্ধি, জন সংখ্যার বিস্ফোরন, বেকার সমস্যা, উৎপাদানের ক্রমবর্দ্ধমান হ্রাস, যুদ্ধ, ঠাণ্ডা লড়াই, অন্তর্দ্বন্দ্ব এবং জীবিকার সন্ধানে ক্ষুরধার প্রতিযোগীতা আমাদিগকে আত্মকেন্দ্রিক ব্যক্তি মানসের এক মানসিক দুরারোগ্য ব্যাধির কবলে ঠেলে দিয়েছিল। স্বার্থ সর্বস্ব এক ব্যক্তি মানসের উদ্ভবে আমাদের প্রাচীন মূল্যবোধ, ন্যায়নিষ্ঠ, সহানুভূতিশীলতা, ধর্ম্ম বোধের আত্মতুষ্টি, ঔদার্য্য ও সুষ্ঠ রাষ্ট্র ব্যবস্থার ভূত-বাজির মত অন্তর্ধান আমাদিগকে হতাশ ও নিরাশ করেছে। এই হতাশা ও নিরাশার মাঝে সত্যাসন্ধ কে নবীন সম্প্রদায় কখন ও রুদ্রকণ্ঠে, কখনও মধুর ভাষায় আমাদিগকে বস্তু সর্বস্বতার নেশার ঘোর কাটাতে প্রযাস পেয়েছিল। প্রাণের ভাষায় অর্থাৎ কবিতায় যাঁরা হারিয়ে যাওয়া মূল্যবোধের জন্য অনুতাপ করেছেন এবং এক আদর্শের উপস্থাপন করতে চেয়েছেন তাদের মধ্যে আমার প্রিয় কয়েক জন আধুনিক কবির আলোচনার মাধ্যমে আমার আধুনিক মনিপুরী কবিতার পরিচিতি তুলে ধরছি।

কবি নীলকান্তকে মনিপুরী কবি গোষ্ঠার প্রথম আধুনিক কবি ধরেই আমাদের এই কবি পরিচিতি শুরু করছি। তার কবিতায় পয়ার

ভাষার সাথে সাথে রাস্তা-ঘাটে; ঘরে বাহিরে, হাটে বাজারের ব্যবহৃত শব্দের প্রচুর ব্যবহার পাওয়া যায়। তবুও তাতে আধুনিক কবির নগ্ন-ভাষণে শ্লীলতা হানির ভয় নেই। বসন্তের আমেজ আছে তার কাব্যরীতিতে। গ্রীষ্মের উষ্ণতা ও শীতের শৈত্য না থাকলে ও সমাজের অধঃপতন ও নোংরামীর প্রতি অর্থপূর্ণ ইঙ্গিত করেন নি এমন নয়। 'শোষণ ক্লিষ্ট মানুষের এই কঙ্কাল মূরতী দেখেছ কবি, দেখেছ কি তার ভগ্ন হৃদয়? শুনায় না আর তোমার বাণী, এই মধুকুঞ্জে বসে'। (ব্যথিত জগৎ)

নীলকান্তের কবিতায় ওয়ার্ডসওয়ার্থ এর লুসীকে পাওয়া যাবে। কৌত্র পর্ব্বত শিখরের মনোরমা যেন লুসীর আপন বোন প্রকৃতিকে ভালবেসেছেন কবি নিজের সমস্ত সত্ত্বা দিয়ে। প্রকৃতি সুরের তালে তাল মিলিয়া কবির হৃদয় বীণা বেজে উঠে। তার মানসী মনোরমাকে কৌত্র শিখরের পর্ণ কুটীরে, প্রকৃতির বুকে লালন পালন করেছেন কবি। প্রকৃতির নিবিড়তম বিদ্যালয়ে মনোরমার শিক্ষা। তাই মনোরমা প্রকৃতির আপন খেয়ালে গড়া এক পূর্ণাঙ্গ কুমারী। কবি বলেছেন ।।

প্রিয়তমে ! তোমার কি মনে পড়ে
কৌত্র শিখরের সেই পর্ণ কুটীরটাকে ?
বিদ্যুৎ চমকে, ঝড়ের রাতে, তুমি যে আমাকে জড়িয়ে ছিলে
(মনে পড়ে কি মনোরমা)

লোকালয়ের পরিচিত বিরহ বিচ্ছেদে কাতর কবি তার প্রিয়াকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন প্রকৃতির শান্ত সমাহিত ও পরিপূর্ণ প্রেমের কথা। কৌত্র শিখরের পর্ণ কুটীরে কবি তার মানসীকে নিয়ে ঋতু পরিবর্তনের প্রতিটি মাধুর্য্য উপভোগ করেছেন গ্রীষ্মের খরতাপে, বর্ষার গুরু গর্জ্জনে, শীতের নিঃসঙ্গতায়, এবং বসন্তের ফুল-সম্ভারে। নীলকান্তকে বর্তমান যুগের কবি বলা যায় যখন তিনি বলেন—

গৃধ্নু, শৃগাল, শকুনীর দল, উড়ছে দলে দলে
এশিয়া আফ্রিকার আকাশে লোলুপ দৃষ্টি নিয়ে
যুদ্ধের বলি দুর্ব্বল জাতির মৃত দেহের লোভে।
আবার কেন এই রাষ্ট্র পুঞ্জের অর্ধোন্মিলিত পতাকা
গান্ধীজীর মহা প্রয়াণে ?   (মণিপুর)

বস্তু সর্ব্বস্ব পশ্চিমী নেতাদের মানবতার অভিনয় রাষ্ট্রপুঞ্জের অর্ধোন্মিলিত পতাকায় উত্তোলনকে বিদ্রুপ করে বলছেন কবি শব দেহ লোভী বিশ্বযুদ্ধের ঘটকগণকে গান্ধীর মৃত্যুতে এই শোক প্রকাশ কি তাদের মনের কথা না নিছক অভিনয় ? নীলকান্তের 'চল আমরা দুজনে কোথা ও যাই' কাব্য গ্রন্থটির আগা গোড়া মানবতার মূল্যবোধ, আদর্শ ও ধর্ম্মের বিলুপ্তির সাথে কবি তাহার মানসীকে নিয়ে কোথাও পলায়ন করায় কবি মানসের আকুল প্রয়াসের কথা ব্যক্ত হয়েছে। হয়তো বা শান্তি ওপূর্ণতার এক জীবনের সন্ধান পাওয়া যাবে — এখানে না হয় অন্য কোথায়ও। কবির বিলাপ যেন বসন্তের ফুল বনে বাতাসের একটুখানি ভোরদার আন্দোলন মাত্র। নীলকান্তের এই মানসিক পরিবেশে যুগের কবি সমরেন্দ্র কিন্তু দৃপ্ত কণ্ঠে বলতেন।

এক রমনী কাঁদছে, কিন্তু আয়াজ নাই,
এক বৃদ্ধ করে প্রতিবাদ. কেহই শুনছে না
সবাই বলছে, জানি না, জানি না,
দেখলে ও দেখি নাই, শুনলে ও শুনি নাই,

সুদূরে দাঁড়িয়ে আছে, বিষ্ণু অবতার
গণতন্ত্রের গনদেবতা ও বোবার মত।

(গোবিন্দ পতনে)

সমরেন্দ্র এই যুগের কবি। তাহার ভাষা জনতার মুখেরই কথা। অলঙ্কার বিহীন. গদ্যের ভাষায় আহ্বান করেছেন চাউল, ডাইল, চিনি ও আলু প্রভৃতির কাল বাজারীগণকে ভূলে যাও তোমায়ে দয় দুর্গন্ধময়

বস্তুপন্থী মনোভাবকে। বেরিয়ে এসো নববর্ষের এই শুভ লগ্নে—

চল যাই আমরা ঐ উচ্চ শিখরে
দেবলোকের কাছে, দেব শিশুর মত খেলি গিয়া—

নববর্ষের এই শুভ লগ্নে
নূতন পোষাকে সাজিয়া
সুন্দর কথা বলি, সুন্দর ভাবনা ভাবি,
ভুলে যাই স্বার্থের কথা আজি হতে।
(উচ্চ শিখরে উঠি)

মুনাফাবাজ ব্যবসায়ীদের নিকৃষ্ট মনোভাবকে কঠোর ভাষায় নিন্দা করেছেন

শ্রাবনের অবিরাম ধারায় চারিদিকে শুধু জল
চাউল ডাইলের দাম বাড়ছে হুহু করে।
ধনঞ্জয়ের মনে আনন্দের সীমা নাই
তাহার গোদামে এবার খাসা ষ্টক
ব্যবসাতে এবার মুখ উজ্জ্বল হবে।
. . . .
ধূপ ধূনা দিয়ে গনেশ, লক্ষী, শিব পার্ব্বতীর
মন জয় করে ধনঞ্জয়।
বাহাদুরকে বলে সাবধান হয়ে
গোদাম ঘরের দরজাটা বন্ধ করেছ ভাল।
চারিদিকে ক্ষুধার্ত্ত কুকুরের দল ঘুরছে।
... ...

শ্রীধীরেনের কবিতার ভাষা আরও দৃপ্ত
ও গ্রীষ্মের দাহ নিয়ে সমাজের নোংরা ও
কদর্য্য মনোভাব এবং কার্য্য কলাপের—
দিকে অঙ্গুলি উঁচিয়ে দেখিয়ে দেয়—

এখন মানুষ হওয়ার দরকার নেই,
হতে হবে মেম্বর যে কোন উপায়ে। (মেম্বর)
. . . .
কংক্রিট পাথর বাহী ট্রাকটির চাকার নীচে
আলোর পিয়াসী ছোট্ট ফুলটির কান্না কেউ শুনেনি।
. . . .

ছয় ফুট লম্বা নোংরা পোষাক পড়া
মিশকাল দাঁতের জ্যান্তব ড্রাইভারটির
অট্টহাসির ত্রাসে, পথের পাশে শুয়ে থাকা
কুকুরটি করুণ বিলাপের সুরে কেঁদে উঠল।
(একটি কুকুরের বিলাপ)

আলোর পিয়াসী ছোট্ট ফুলটিকে রোলার কর্ত্তৃক নিষ্পেসিত হওয়াতে অথবা পাথর চাপা পড়ায় সমাজের নোংরা ও হৃদয়হীন মানুষগুলির প্রতীক দানব ড্রাইভারটির নৃশংসতা একটি কুকুরকেও পরাজিত করেছে। তাহার অট্টহাসির চিত্রটি নিখুঁত ভাষায় অঙ্কন করে কবি নিন্দা করেছেন শোষক ও অত্যাচারী মানুষকে। মানবজীবনের বর্তমান রূপ অঙ্কনে শ্রীবীরেন——

জীবনতো একটা বিরাট কৌতুক,
. . . .
সুন্দর অসুন্দর সবই ভাবের সৃষ্টি
. . . .
সত্য মিথ্যা ইহা ও ভাবের সৃষ্টি
... ...
(হতভাগা জন্তুটির ভাবনা)

অদৃষ্টের পরিহাসকে উল্লেখ করে কবি বলেছেন তাহার 'হতভাগা জন্তুটির ভাবনা' কবিতায়,

কেন চিলটি আমাকে রেখে গেল এখানে
শহরের এই ব্যস্ত রাস্তায় যানবাহনের ভীড়ের মাঝে
. . . .
তারপর এক কদাকার ট্রাকের চাকার নীচে
. . . .
হতভাগা ইঁদুরটি সশব্দে কেটে গেল নিষ্পেসিত হল
. . . .
কেন ? কেন ? এমনটি হ'ল ইঁদুরটার জীবনকে নিয়ে ?
(হতভাগা জন্তুটির ভাবনা)

দুর্মূল্যের বাজারে কঙ্কালসার দরিদ্র জনতার সকরুণ চিত্রাঙ্কণে আধুনিক কবিদের অন্যতম কবি ইষোপিশাক্—

দলে দলে লোক ছুটে দুরু দুরু বুকে,

তাহাদের স্থির দৃষ্টি রেশনের দোকানে
গ্রীষ্মের রদ্দুরে দীর্ঘ সারির মাঝে দাঁড়িয়ে
কান্নার স্বরে তারা বলছে; 'আমাকে আগে দাও'।

(ধ্বসে যাওয়া মূর্ত্তী)

তারপর কবি নিষ্পেষিত, শোষিত, সুকুমার বৃত্তি বঞ্চিত ঋণদায় গ্রস্ত মণিপুরী মানুসের ভিতর ও বাহিরের একটি অমর চিত্র অঙ্কন করেছেন তাহার কবিতায়।

"আজকের মনিপুরী প্রজারা যেন
ধ্বসে যাওয়া প্রাচীন রাজধানী প্রাচীরের
টুকরো টুকরো ইটের ভগ্ন হৃদয় মাত্র"।

(ধ্বসে যাওয়া মূর্ত্তী)

জীবনের মুল্যাঙ্কনে ইবপিশাক এর নিরাশ কণ্ঠ আমাদিগকে ভাবিয়ে তুলে—

নেশা মত্ত সেই ক্ষনটির নাম জীবন।

* * *

সত্য ? সে তো কাগজের ফুল চেতনাহীন।

* * *

এক সত্য ভাষণের জন্য কাল সব মুখ হারালাম।

* * *

মক্ষিকাটি ভাবে ক্ষণিকের নেশাতুরতার পর
হায়রে জীবন। তুমি কি সেই নেশানুত্ত ক্ষণটিই ?

ধর্ম্মের নামে অধর্ম্ম দেখে, ব্যথিত কবি ইবপিশাক আঙ্গুল উচিয়ে আমাদিগকে দেখায় সমাজের ব্যভিচার ও নোংরামীকে—

পীচকারীর দিন।
গোবিন্দের মন্দির প্রাঙ্গণে
তোমার ভক্তরা একা লীলায় মেতেছে ?

Dedicated to those heroes who strive hard to bring Emotional Integration in India.

এ আবার কেমনতর ভক্তির মার্গ হে ভগবান ?

*　　*　　*　　*　　*

হাজার বৈষ্ণবীর নগ্ন গায়ে

অন্ধকারে হাত বুলায়, হাজার ভক্ত বৈষ্ণবরা।

শরৎ রজনীর মত শুকরের মত

হাজার বৈষ্ণব আজ বৈষ্ণবীর মাংস উপভোগ করছে।

*　　*　　*　　*　　*

এই মৃত্যুর পথ ছাড়া আমাদের উপায় কি ?

জীবনের সত্য ঘটনার বিন্যাসে অতিভৌতিক স্পর্শ দানে পারদর্শী শ্রীব্রজেশ্বর—

শহর থেকে বাসগুলি চলে গেল

যেখানে প্রকৃতির সুখ দুঃখের কথা বলে।

অভাব ক্লিষ্ট শিক্ষক সমাজের হাস্যকর ভাব বিলাসের সকরুণ পরিণতি অঙ্কনে সর্ব কনিষ্ঠ কবি চৌধুরীর কয়েকটি লাইন উল্লেখ করার লোভ সম্বরণ করতে পারছিনা—

ঘরের অভাব ভুলে, জ্যোৎস্নায় মাতাল হয়ে
চাঁদের আলোয় খুঁজি মধু-মিতার হাসি।
দুষ্টুমী করে মৌসুমী হাওয়া
আমার ছেড়া কোটটিকে খুলতে চেয়েছিল।
তখন এক প্রচণ্ড শীতের শিহরণ কেড়ে নিয়েছিল
আমার রূপালী ভাবনার শ্বেত পায়রা গুলিকে

* * * * *

আমার প্রিয় বোনটির বিদ্রূপের হাসি
আমার পয়ত্রিশ বৎসরের মনকে যেন

* * * * *

এক পরিত্যক্ত ভুতুড়ে বাড়ীর মত নিঃ সঙ্গ করে গেল,
শীতের শিহরনে ছেড়া কোটটাকে আঁকড়ে ধরলাম
তখনই মনে পড়ল, আমার স্ত্রী ও পুত্রের কথা।

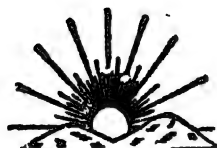
আধুনিক মনিপুরী কবিতার পরিচয় কতখানি দিতে পারিয়াছি জানি না। তবে আমার বিশ্বাস কবি মানসের টুকরো টুকরো পরিচয় দিতে পেরেছি। যুগে যুগে দেশে দেশে, কবিদের জন্ম হয়েছে। তাহাদের ভাবনার নীল আকাশে সকলেই চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, তারার মত নিজ নিজ ক্ষেত্রে ভাস্বর এবং সত্তায় এক। শুধু ভাষার পার্থক্য ছাড়া, কবিদের মন এক। তাহারা সকলেই প্রাণের কথা বলছেন কখন ও রুদ্র হয়ে আবার কখন ও কোমল হয়ে। মনিপুরী কবিদের ভাবনা তাহার যুগের সমাজের,

মার

ব্যক্তি মানসের, আশা-নিরাশার, নীতি ও আদর্শের জগতে লীলায়িত, আনন্দোলিত হয়ে কখনও হাসছে; কখনও কাঁদছে। এই ক্ষেত্রে বিশ্বের যে কোন কবিদের সাথে তাহারা এক ও অভিন্ন।

বাংলা ভাষাভাষী পাঠক সমাজকে আধুনিক মণিপুরী কবিদের পরিচয় দানে শ্রীব্রজেশ্বর এবং এই কথিকার লেখক চৌধুরী সাহেবের এক অভিনব প্রচেষ্টা তাহাদের আধুনিক মণিপুরী কবিতার অনুবাদ গুচ্ছটি কবিদ্বয়ের এই মহতী প্রচেষ্টা পাঠক সমাজের সহানুভূতির অপেক্ষা রাখে। এই প্রচেষ্টা যদি ভাব জগতের ঐক্য আনিতে সাহায্য করে, কবিদ্বয়ের প্রচেষ্টা সাফল্যমণ্ডিত হইবে। আশা করি তাহাদের এই অনুবাদ গুচ্ছটি বাঙ্গালী পাঠক সমাজকে নতুন রকম পরিবেশনে-সাহায্য করিবে। জয় হিন্দ!

খৈরুদ্দিন চৌধুরী



খৈরউদ্দিন চৌধুরী

ক্ষণিকা

জীবনের হাসি-অশ্রুর এ সবুজ প্রান্তরে
পূর্ণিমার সেই শুভ্র পবিত্র তিথিতে
পল্লী-জননীর আম্রকানন পারে
আলোছায়ার রহস্যময় ইন্দ্রজালে
মন্ত্র মুগ্ধ কণ্ঠে তুমি বলেছিলে,
জীবনে মরণে তুমি যে আমার প্রিয়
প্রদীপের সাথে আলোর মত
থাকি যেন চিরদিন, তোমার সাথে।

বিগত বসন্তের কোন এক মহেন্দ্রক্ষণে,
ফাগুণের আগুন লাগা সেই কাননে
বাহুলতা জড়ায়ে, সঘন নিঃশ্বাসে নিবিড় চুম্বনে,
কানে কানে তুমি আমায় বলেছিলে,
হাসি অশ্রুর এই মধুমালঞ্চে
হাসব কাঁদব আমরা একই সুরে।

সুনীল আকাশের নীচে, সেই নদীতীরে,
লতায় পাতায় ঘেরা সেই পর্ণকুটীরে
সূর্য্যস্নাত সুদূর পাহাড়ের সেই নীলিমায় চেয়ে
পরম তৃপ্তির সাথে বলেছিলে তুমি,
সার্থক এ জনম আমার তোমাকে পেয়ে,
হাসি আর অশ্রুর এ মধুমালঞ্চে।

কিন্তু হায়! দৈবের একী অভিপ্রায়
অজ্ঞাতে এল সেই সকরুণ দুঃসময়।
নিভে গেল আমার সেই প্রদীপের আলো;
বালুচরে রচেছিলাম সেই মধুস্বপ্ন
ব্যর্থ জীবনের এ পাষাণ তটে উর্ম্মি-মালার মত
করুণ কেঁদে, হেরে গেল, সে আমার, অনন্ত অশ্রুর দরিয়ায়

রৌশন্ এর অভিষেক

জনক জননীর জীবন অরণ্যের গহন তিমির আধারে
আশা-নিরাশার সবুজ পাতার ফাঁকে ফাঁকে
ফেরেস্তাসম রৌশন্ আমার উকি দিল বুঝি ঐ
হাসি অশ্রুর ফুল বাগিচায়, মোদের কুটীর প্রান্তে।
শুষ্ক মরুর দগ্ধ বুকে এল বুঝি আজ মধু বসন্ত ॥
পিয়াসী বুল বুল গেয়ে উঠে ঐ বিরহী মরুস্থানে।
ফুলবনে আজ এত আনন্দ ! বুঝিবা কাহার ও অভিষেক!

ওগো বিহঙ্গী। চির আনন্দ নন্দিনী,
গুল বাগিচার চিরযৌবনা মধুপ সঙ্গিনী,
মিষ্টি হাসির দুষ্টুমী ভরা, নীল আকাশের তারারা,
কলনাদিনী দুলালীকন্যা, মধুভাষিণী ঝরণারা,
দূর পাহাড়ের নীলার সাথী, সবুজ বনানী তরুণী
চন্দ্র সূর্য্য-গ্রহ তার, ধরণী মায়ের নয়ন মণিরা
এসো, এসো, ভাই বোনেরা
মূর্ত্ত কর আজি অভিষেক মোর সন্তানের ॥

জনক- জননীর নয়নের জ্যোতি—রৌশন্।
দুইটি তৃষার্ত্ত যুগ্ম প্রাণের তুমি যে মধু স্পন্দন,
পূর্ণিমার চাঁদ হার মানে তোর সুধামাখা মুখ চেয়ে।
সূর্য্যত শুধু ধরণীর আলো
তুমি যে জীবন জ্যোতি,
জনক-জননীর প্রাণের প্রাণ
তুমি যে অতুল ভুবনে।

মানব-মানবীর পর্ণকুটীরে তুমি যে দীপ,
জীবন বৃক্ষের অমৃত ফল-তাদের সার্থকতা,
হাসি-কান্নার জীবন মালঞ্চে, সবুজ পত্র মাঝে,
ধীরে ধীরে তুমি বিকশিত হও
সৌরভে আর মাধুর্য্যে। ধন্য হউক, এ জীবন ।

জীবন-তোমাকে আমি দেখেছি

ওগো জীবন! তোমাকে দেখেছি আমি
কুমড়া গাছের ঝরা পাতায়,
নোংরা শহরের এই গর্ত্তের ধারে
সবুজ শীম গাছের পাশে
তিলে তিলে ঝরে যেতে দেখেছি তোমায়।

প্রতিদিন পরিচিত পথের ধারে
তিলে তিলে মরতে দেখেছি তোমায়,
নোংরা শহরের গর্ত্তের ধারে,
একটি কুমারী শীম গাছের পাশে।
সবুজ যৌবন আর অকালে ঝরে যাওয়ায়
নির্ম্মম ব্যবধান দেখেছি—
দেখেছি শহরের নোংরা গর্ত্তের ধারে।

হে জীবন! দেখেছি তোমাকে আমি
অকালে ঝরে যাওয়া কুমড়া পাতায়
নোংরা শহরের এক গর্ত্তের ধারে
ভাঙাকাঁচ আর আবর্জ্জনার মাঝে।
প্রাণহীন শহরের পাথরের বুকে,
জীবিকার উপাদান অমৃত বিহনে
ধীরে ধীরে মরে যেতে দেখেছি তোমায়।

সতের

ওগো জীবন! কী কঠোর তোমার মায়া
হাসি-অশ্রুর এই ঝালকে নেই অবকাশ,
তিলে তিলে ঝরে যাওয়া জীবনের কথা রচিবার
তাই লিখি, জীবন-মৃত্যুর এই নাট্যশালায়
নেই অবকাশ শুধু মৃত্যুর কথা রচিবার
তাই শুনি অমৃতের গান, মৃতের মিছিলেও।



একটি তাল গাছ

যুগ যুগ ধরে বুড়ো তাল গাছটি
দাড়িয়ে আছে আমার বিচারক বন্ধুর বাড়ীর সামনে,
শহরের এই প্রান্তে যেখানে কোলাহল কম।
সভ্যতার ইতিহাসের প্রাচীন ছাত্র,
তোয়েনবীর প্রিয় শিষ্য বুড়ো তালগাছটি
এই শহরের উত্থান-পতনের নীরব সাক্ষী।
অনতিদূরেই একটি সমাধি,
মাঝে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত কয়েকটি দালানবাড়ী
কোনটাতে মানুষ থাকে, কোনটাতে পণ্যদ্রব্য।
মনে হবে অন্যমনস্ক কোন ভাস্করের
খাম খেয়ালের পশ্চাদ্‌ভূমি এই স্থান।
ঘরগুলি অর্দ্ধসমাপ্ত ও বিক্ষিপ্ত,
মালিক গুলির অবস্থাও তেমনি মনে হয়—
কোথাও যেন একটি ছিম-ছামের অভাব।

বুড়ো তাল গাছটি নীরব দর্শক
এবং এই অঞ্চলের উত্থান-পতনের সাক্ষী।
সরলভাইকে বুদ্ধিমান ভ্রাতার প্রতারণা,
অক্ষমকে ক্ষমতার নির্ম্মম পরিহাস,
তার পর অপমানিতের নীরব অশ্রুবর্ষণ।

ঊনিশ

ক্ষমতার ও সামর্থ্যের ক্ষণস্থায়ী আস্ফালন
তারপর স্ফীতকায় বেলুনটির চুপ্‌সে যাওয়া
শূন্যতা এমনকি ব্যক্তিত্বের নবজন্ম।
কতকিছুই ঘটে গেল কিন্তু তখনও নির্বাক তালগাছটি।

চাঁদের আলোয় মসজিদের চুনকামকরা গম্বুজগুলি
শ্বেত-শুভ্র গাম্ভীর্য্যে দাঁড়িয়ে আছে
তালগাছটির উচ্চতাকে ম্লান করে।
কর্মক্লান্ত শহরবাসীরা নিজ নিজ গৃহে ফিরে গেছে
শুধু আমি গরীব শিক্ষক, এখনও পথে পথে ঘুরছি
ঘরের অভাব ভুলে, জ্যোৎস্নায় মাতাল হয়ে
চাঁদের আলোয় খুঁজি মধুমিতার হাসি।
দুষ্টমী করে মৌসুমী হাওয়া
আমার ছেড়া কোটটিকে খুলতে চেয়েছিল।
তখন এক প্রচণ্ড শীতের শিহরণ কেড়ে নিয়েছিল
আমার রূপালী ভাবনার শ্বেত পায়রাগুলিকে।
মিতার কমনীয় প্রিয় মুখখানি হারিয়ে গেল
কোথাও যেন চাঁদের আলোয়।

ছোট বোনটির মুক্তামাখা হাসি
কৈশোর-যৌবনের এক সবুজ বৃন্তে
অপূর্ব্ব সুধামাখা সেই নির্ম্মল হাসি

কাকলির মত সেই মিঠুল কণ্ঠে,
বিদ্রুপ করে যেন বলে যায়—
মাষ্টার মশাই, আপনি কতইনা বোকা ?
লোকালয় ছেড়ে চাঁদের আলোয়
মিথ্যা খুঁজেছেন আমার রূপ
আমি যে তোমার হৃদয়ের কোণে, কুন্দকলি ।

মড়্ মড়্ করে ঝরে পড়ল, একটি বৃদ্ধ পত্র,
অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে থাকি তালগাছটির নীচে ।
একী বিপর্যয় ঘটে গেল, আমার দেহ ও মনে ।
শিশির বিন্দুর পতন যেন তৃণপত্র থেকে,
আলোর অন্তর্ধান যেন সূর্যাস্তের সাথে ।
আমার পয়ত্রিশ বছরের মনকে যেন
পরিত্যক্ত ভূতুড়ে বাড়ীর মত নিঃসঙ্গ করে গেল
আমার প্রিয় বোনটির বিদ্রূপ হাসির মরীচিকা ।
শীতের শিহরণে কোটটাকে আঁকড়ে ধরলাম,
তখনই মনে পড়ল, আমার স্ত্রী ও সন্তানের কথা ।

—I।

আমার প্রিয় গানটি

তখনও প্রভাতের কনক আভা,
সবুজ পৃথিবীর ভোরের আসরে
আমন্ত্রিত হয়েও আসেনি।
পল্লী ও শহরের মিলন ভূমি
নীরব সেই পথে আমি একা
প্রাতঃভ্রমণে বেরিয়েছিলাম।
শ্যামল পত্রের ফাঁকে ফাঁকে
চুণ-কাম করা বাড়ীগুলি যেন
হাতছানি দিয়ে ডাকছে আমায়।
মন্ত্রমুগ্ধ পথিক আমি।

জানিনা কখন সূর্য্যরশ্মির
প্রথম পরশ পেয়েছিলাম,
নাম না জানা এক গানের কলি
হৃদয়মথিত করে গুন্ গুন্ গেয়েছিল,
কিন্তু ছিলনা কোন ধ্বণি।

পরক্ষণে দেখি ঘাসের উপরে হাজার শিশির বিন্দু
কনক আভায় ঝল্‌মল্‌ হয়ে গেয়েছিল সেই গান

বাইশ

যে গান আমি অনেক করেও গাইতে পারিনি তখনও।
অপলক চোখে দেখেছি আমি সেই অপূর্ব্ব শোভা
তারপর আমি সন্তর্পণে এনেছি হৃদয়ে পুরে
অশ্রু ভেজা আমার সেই গানের কলিটিকে।

হায়! একী অপূর্ব্ব পরিণাম!
প্রভাত বায়ুর পরশ মাগিয়া
ভোরের পথে বেরিয়েছিলাম
কিন্তু হায়! বন্দী হইলাম শিশির বিন্দুর গানে।
প্রতি মুহূর্ত্তে, একই আনন্দে, শিহরিত হয়ে ভাবি
মহানন্দের এই আয়োজন কাহার অভিপ্রায়?
কখন সূর্য্য বাঁশবন 'পরে উঠেছিল জানিনা,
কারখানার কর্কশ কোলাহলের মাঝে
আমার প্রিয় গানটিকে হারায়ে ভাবি
বিংশ শতাব্দীর যন্ত্র সভ্যতা আমাকে দিয়েছে কি
কেড়ে নিয়ে সেই অশ্রুভেজা গানটি আমার?



লক্ষ্মীর বিলাপ

তীব্র এক বিশ্বাস আমাকে
যক্ষের অর্থ সর্বস্ব হৃদয়ের বালুচরে
সহানুভূতির বীজ বপন করতে বলেছিল।
ক্ষত বিক্ষত মন আমার
দারিদ্রের নিষ্ঠুর তাড়নায়,
সৃষ্টির অদম্য আবেগের চাপে
বিদ্রোহ বিমুখ হয়ে বলেছিল,
দ্বিধা সঙ্কোচের ঘন অরণ্যের
হিংস্র আরণ্যককে জয় কর,
বিশ্বাসের শীতল সলিলে
অবগাহন কর, জীবন মালঞ্চের
ক্ষণিক সুধাকে উপভোগ কর।
তাই অতীতের পরিচিত একবন্ধু
লক্ষ্মীর বরপুত্রের কাছে বলেছিলাম
আমার অভাবের ধূঁয়াটে কাহিনী।
লক্ষ্মীর শ্রী থেকে বঞ্চিত হতভাগা,
বহুদিন আগেই হয়েছিল কুবেরের ভক্ত।
লক্ষ্মী ছাড়া বন্ধুর সহানুভূতির প্রতীক্ষা
এবং আমার তীব্র বিশ্বাসকে ধিকৃত করি।
নিজের দারিদ্র্যকে বাজারে তোলার জন্য
ঘৃণায়, লজ্জায়, গ্লানিতে ভরে উঠে অভিমানী মন।
হায়! কস্তুরী মৃগ নাভীর সৌরভ খুঁজেছি
বিকৃত মনের প্রতীক বস্তু গন্ধী হৃদয়ে।
প্রতীক্ষায় ক্ষুব্ধমন বিদ্রোহ করছে
কোথাও পাইনি খুঁজে কোন এক সহজ সমীকরণ।

জানতে পারলাম, বস্তু সর্বস্ব বন্ধুর যক্ষ পুরীতে
সহানুভূতির মৃত্যু হয়েছে অনেকদিন আগে।
পলে পলে গড়ে উঠা কার্পণ্যের রাজ্যে
নগ্ন পয়সার নৃত্যের আসরে বাঈজী মন

চব্বিশ

শুধু অর্থকেই ভালবেসেছে সব কিছু দিয়ে।
আদিম কোন এক বাঁশ বনের আধারে,
পেঁচকের করুণ কান্নায় লক্ষ্মীর বিলাপে
ব্যাথাতুর নেই-নেই-কিছু নেই রব
সন্ধ্যার অন্ধকারে এই প্রেত লোকে একা আমি
লক্ষ্মীর বরপুত্রের আশীর্ব্বাদপ্রার্থী।
বৃদ্ধ শিমুল গাছটির অন্ধকারে কারা যেন
ফিস্ ফিস্ করে বলছে আমাকে লক্ষ্য করে,
"পালাও, পালাও. এখ'নে লক্ষ্মী নেই,
আছে শুধু তার শব দেহ, প্রেতাত্মা;
দেখতে পাওনি বুঝি, শ্রীহীন যক্ষপুরীর
অকাল বার্দ্ধক্যের সকরুণ রূপ।
এখানে সম্পদ শুধু অর্থহীন সঞ্চয়।"

কতক্ষণ দাঁড়িয়েছিলাম জানিনা,
বাঁশবনের অন্ধকারে একা, একা,।
লক্ষ্মীর বরপুত্র বন্ধুটির ফিস্ ফিস্ প্রশ্ন—কেন এসেছেন?
আমার সমস্ত শরীরের লোম দাঁড় করিয়েছিল।
ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে, কম্পিত কণ্ঠে বলেছিলাম,
আমার বন্ধুর বাড়ীতে, আশীর্ব্বাদ পেতে।
প্রেতাত্মার বিকট হাসি দেখিনি কখনও,
তবে হ্যাঁ, উহাও সকরুণ হতে পারে
সেদিন বুঝেছিলাম তার শুষ্ক মুখ দেখে।
ফিস্ ফিস্ করে বলেছিল সে—
কাল রাত সব চুরি হয়ে গেছে—
আমার রিক্ততা অনুমান করতে পার
তোমাকে কি দিতে পারি আমি?
বাক্য ব্যয় না করে লক্ষ্মীর বরপুত্রকে
আশীর্ব্বাদ দিয়ে ফিরে এলাম
পথে তখন কৃষ্ণপক্ষের ঘণ অন্ধকার।

লাইশ্রম সমরেন্দ্র সিংহ

পিকাসো

তীব্র-তিক্ত পানের অযোগ্য
আমার চায়ের কাপটিকে ফেলে দিলাম,
প্রাঙ্গণের বালুকার মাঝে।
তখনই উদ্বুদ্ধ হ'ল, স্বর্গের এক অপূর্ব নর্তকী
বালুকার কনক প্রভাকে ম্লান করে।
তারপর বালুকার স্পর্শে শুকিয়ে যাওয়া
চায়ের সাথে, সাথে, অদৃশ্য হল সেই নর্তকী।
তখনও পিকাসো আসেন নি।



ক্ষীণতর হয়ে যাই আমি

শহরের রাস্তাটির বিস্তৃতির সাথে সাথে
গভর্ণর মশায়ের গাড়ীর কলেবর বৃদ্ধির সঙ্গে, সঙ্গে.
প্রতিদিন ক্ষুদ্রতর হয়ে যাই আমি।
রেশন কার্ড হাতে দীর্ঘ সারিটির শেষ প্রান্তে আমি
যখন তাকাচ্ছিলাম দূর দিগন্তের ধূসরতায়
হঠাৎ এক পাথরবাহী ট্রাক পাশ কেটে চলে গেল।
আঃ একটুকুর জন্য বেঁচে গেলাম।
অদূরের একটি প্রভুহীন কুকুরের শেষ আর্তনাদ
আমাকে দিয়েছিল পীড়া—অব্যক্ত।
কুকুরটি গাড়ী চাপা পড়ল—বীভৎস দৃশ্য।
একটু পরে এসে নিয়ে গেল কুকুরটার শবদেহ,
মিউনিসিপালিটির এক নির্বিকার যান।



আটাশ

শূন্যে ঘুরছে পৃথিবী

পৃথিবী, পৃথিবী, হে আমার প্রিয় পৃথিবী!
আমার গৃহ, আমার দেশ,
আমার সন্তান, আমার প্রিয়া,
আমার বংশধারার আবাসভূমি, হে পৃথিবী,
আমার প্রিয়জনের হে প্রিয় পৃথিবী।
সবুজ পর্বতমালার, সুশীতল ধারার
হে অপূর্ব্ব পৃথিবী,
আমার বিচরণভূমি, ভ্রমণের লীলাভূমি,
অর্থহীন অনেক কাজের, কর্ম্মক্ষেত্র
স্বার্থের—মিথ্যা ভাষণের দুরন্ত পৃথিবী
আমার প্রিয় পৃথিবী, আমার ভয়ের পৃথিবী
আমার বৈরীর হে প্রিয় পৃথিবী।
শক্তি ও বিক্রমের নির্লজ্জ বিকাশভূমি
ক্ষুদ্র ও বিত্তহীনের ধূঁয়াময় পৃথিবী
শক্তের ভক্ত ও নরমের যমের হে পৃথিবী
গান্ধীর নামে, ধর্ম্মের নামে সত্যের নামে
নির্লজ্জ ব্যবসায়ীদের হে নির্ম্মম পৃথিবী
ঘুরতে থাক, ঘুরতে থাক, যতক্ষণ না সম্বিৎ হারাও

:—◡—:

গোবিন্দ সকাশে

আমার দ্বিধার পরিধি ছিল অতীব সংক্ষিপ্ত,
এক দুর্ধর্ষ ভক্ত এগিয়ে এল,
হাতে তার ক্ষুরধার তলোয়ার।
নিঃসঙ্কোচে আঘাত হানল গোবিন্দের সিংহাসনে,
একী হল! একী হল! বিস্মিত কলরব
চারিদিকে নীরব, চাপা গুঞ্জরণ।

এক রমণীর কান্না শুনেছি—শব্দহীন
এক বৃদ্ধের প্রতিবাদ ছিল—কেউই শুনেনি,
সবাই বলেছে, আমি জানিনা, আমি জানিনা,
কেউই জানেনা, শুনেও শুনে নাই।

দেখুন অদূরে শূন্যমাঠে সমবেত দেবতারা।
আরও দূরে দাঁড়িয়ে আছে বিষ্ণু অবতার—
গণতন্ত্রের দেবতাগণও চুপটি করে দাঁড়িয়ে আছে
বোবার মত।

শ্রাবণের বারিধারা

(১)

গুরু গরজনে কৃষ্ণকাল মেঘ
শ্রাবনের আকাশ করেছে অবলুপ্ত।
হে ভগবান! তোমার করুণাধারা
গ্রাম ও শহরের পথঘাট করে প্লাবিত।
থৈ থৈ করে খাল, বিল, পুকুরের জল।
বেঙের ডাকে মুখরিত হয়, শূন্য আকাশ।
শূন্যপথে কেহই নাই,
কাল গাভীটি শুধু গর্ভভারে হাটছে ধীরে,
শ্রাবণের ধারা করেনি ক্ষমা মাতৃ-সম্ভবারে।
গরীবের কুটীর ছাউনির অভাব
সদ্য প্রসবা গরীবের স্ত্রী কাঁপছে গৃহের কোণে।
ওগো দূরন্ত শ্রাবণের ধারা!
তুমি শুধু বুঝ অবিরাম বরষণ!
ধনী দোকানদার ধনঞ্জয়ের বাড়ীর দরজা বন্ধ হ'ল
সর্ব্বকনিষ্ঠা স্ত্রীকে নিয়ে আগুনের ধারে বসে
আলস্যভরে প্রশ্ন করে জানালায় ফাঁকে চেয়ে
এখন চালের দাম কত বাজারে?
যদিও সে ক্ষুদে ব্যবসায়ী হিসাবে।
গোমস্তী বলে উদাস কণ্ঠে ধীরে ধীরে

গ্রামের বাজারে কোথাও আশি
আবার কোথাও নব্বই টাকা মণ।
উজ্জ্বল মুখে মন্তব্য করে ধনঞ্জয়
মানিক বসানো হাতের অঙ্গুরীয়টির পানে চেয়ে
এবার দেখছি, চালের দাম আরও বাড়বে।
চাল ডাল, মাছ এমনকি জ্বালানি কাঠ
সবইত মজুত আছে—কিসের অভাব ?
যত খুশী ঝরুক শ্রাবণের ধারা, ক্ষতি নেই।
বাধনহারা শ্রাবণের ধারা—
ঝরছে টিনের চালে অবিরাম
এবার চাল ডালের দাম বাড়বে হু হু করে।
শহরের পথে চোর-মস্তান কুকুর ছাড়া নেই কেহ।

(২)

ধূপ্ ধুনা দিয়ে গনেশ-লক্ষ্মী
শিব-পার্বতীর মন জয় করে ধনঞ্জয়
তেত্রিশ কোটি দেবতারা পুরী, গয়া, কাশী
হৃষিকেশ, হরিদ্বার ছেড়ে সমবেত হল
ধনঞ্জয়ের গোদাম ঘরের অমরাবতী ঘিরে।
কপালে সিঁদুরের বিরাট ফোঁটা একে
গলায় গলাবন্ধ জড়িয়ে ধনঞ্জয় হাঁকে:
ওরে বাহাদুর খেয়াল রাখিস্ গোদাম ঘরের দরজা,

আজকাল শহরে চোরের দৌরাত্ম বেড়েছে।
বুঝলে'ত বাহাদুর, দরজা বন্ধ করিস্ ভাল করে।

(৩)

শ্রাবণের ধারায় প্লাবিত দেশ
নিদারুণ দেশের খবর।
দেখতে দেখতে ধনঞ্জয়ের গোদাম ঘর
জলের প্লাবনে ছেয়ে গেল।
শ্রাবণের ধারায় শহরের পথে
নোংরা স্রোতে ভেসে চলেছে চাল-ডালের বস্তা কত।
তার সাথে হায়, ভেসে এল ঐ
ধনঞ্জয়ের ধুপ-দানি লক্ষীর বর নিয়ে।



শ্রীযুক্ত মলেম্বম বোমচা সিংহ

রাতের জোনাকী

ভাল লাগছে না ভাবতে, আমি বাঁচব।
আবার মনে হয়, 'কেনইবা মরব'?
সর্ব্বত্র শুধু অভিনয়ের মেকী বাজার
পা রাখার ঠাঁইটুকুও অবশিষ্ট নাই, ফাঁকির ভীড়ের মাঝে।
মনে হল, আমি যেন এক রাতের জোনাকী।
আলো—শুধু কি তাই? আঁধার—তাও ত নয়?
আমি ও কি অভিনয়? হয়ত বা বাস্তব?
রাতের অন্ধকারে, কখনও বাঁশবনের স্যাঁত স্যাঁতে ছায়ায়
আবার কখনও শৌখীন গোলাপ বাগিচায়
আলো আঁধারের পদচিহ্ন রেখে যেতে চাই
কিন্তু আমি যে মর্ত্ত্যের এক ক্ষুদ্র জোনাকী,
সূর্য্যের চেয়ে বৃহৎ গ্রহ তারারা আমাদের চোখে ক্ষুদ্রতর
তাই দিনের আলোয় বাঁশবনের স্যাঁত স্যাঁতে অন্ধকারে
নিজের ক্ষুদ্র পাখাগুলি গুটিয়ে ভাবি
আমি কি সৃষ্টির এক বিরাট পরিহাস—অভিনয়?
সমাধির নির্জ্জন পরিবেশে, ঝোপের আড়ালে,
আবার স্মৃতিফলকের লেখনীর নীচে,
অথবা কাহারও শুভ্র প্রিয়ার মাটীর দেহের উপর,
কখনও বা লাল গোলাপের পাপড়ির নীচে,
আমি একান্তে হাসব বাস্তব অবাস্তব ভেবে
জোনাকী জীবন আমার আলো আর আঁধারের
সত্য ও মিথ্যার অবাস্তব কথা থাক ক্লান্ত আমি,
জন্ম আর মৃত্যুর এ কঠোর সততার
সত্য আর মিথ্যার মিথ্যা ভাবনা থাক
আমি সত্য—সত্য আলো—সত্য আঁধার।

রক্ত দুঃস্বপ্ন

সোনার পাখানা মেলে দেবশিশুরা উড়ছিল
একটি বিরাট ঝুলি নিয়ে আলোর আকাশে
তার বিস্তৃতি ছিল মনোময়,
থোকা থোকা তারার ফুল ঝরছিল তাহারই উপর।
উড়ছিল দেবশিশুরা ছোট্ট পাখানা মেলে, দুলে দুলে
আর গাইছিল যেন কেঁদে কেঁদে,
'ওগো বন্দিনী রাজকন্যা বেরিয়ে এসো, বেরিয়ে এসো;
বানিয়ে দেব তোমার নীড়;
হাতভালি দেবতার হ'য়ে
মনমরা থেকোনা আর, লক্ষীটি
বেরিয়ে এসো! বেরিয়ে এসো!

ঝুলির ভিতর থেকে রক্তচক্ষু ভগবান বুদ্ধ যেন
আমার দিকে তাকাল। ভীত ও সন্ত্রস্ত আমি।
ব্যাঘ্র-বুদ্ধ হিংস্র মূর্ত্তী নিয়ে ভয়ানক গর্জ্জন করে
রক্তাক্ত মুখে দেবশিশুগণকে চিবুচ্ছে
তাহাদের ছোট্ট ডানাগুলি ছট্‌ফট্‌ করছে শূন্যে
তারপর হিংস্র জন্তুটি আমার দিকে ধাওয়া করছিল
আমি প্রাণের ভয়ে একটি সুরঙ্গ পথে প্রবেশ করলাম।
সেখানে হাজার সর্প ফণা তুলে- হিস্‌ হিস্‌ করছিল।
প্রাণপণে ছুটলাম আমি জনতার ভিড় ঠেলে বাজারের ভিতর।

ছয়ত্রিশ

সেখানেও এক বিরাট ট্যাঙ্ক দানবের মত ধেয়ে এল
আমার শুষ্ক বুকে হাত দিয়ে দেখি দ্রুতগতি হৃদপিণ্ড
প্রাণপণে ছুটে গেলাম একটি বাড়ীর বন্ধ দুয়ারের সামনে
সজোরে করাঘাত করে চিৎকার করি, দরজা খুলুন, দরজা খুলুন।
ভিতরের, কণ্ঠস্বরে আশান্বিত হয়ে আরও জোরে কড়া নাড়লাম।

ভয়ে কণ্ঠস্বর কাঁপছিল, কিন্তু দরজা খুলেনি
ভিতরের আওয়াজ তীব্রতর হ'ল, মনে হ'ল বর্ষাটা ' ফেটে যাবে
প্রাণটাও ওষ্ঠাগত. বিকৃত কণ্ঠস্বর · তবুও চীৎকার করেছি
দরজা খুলুন, দরজা খুলুন ।
কিন্তু খুলেনি।



হাতকড়ি

চারিদিকে ক্ষুব্ধ ক্ষুধার্ত কুকুরগুলির ঘেউ ঘেউ।
মৃত ও গলিত দেহের দুর্গন্ধের মাঝে
কান্নার মত শুনায়—কাদের এই কোলাহল?
মর্ম্মর প্রাসাদের নিস্তব্ধতা ছিন্ন হয়,
স্বপ্ন ভেঙ্গে যায় স্খলিত বসনা সঙ্গিনীর।
আর ঘোলাটে চোখ দু'টীতে স্বপ্ন মেখে
বিরক্তির ভ্রূকুটী দিয়ে প্রশ্ন করে
গণতন্ত্রের মুকুটহীন সম্রাট,
'কাদের এই আস্পর্দ্ধা নেতার নেশার ঘোর
কাটাতে চায় ভিক্ষুকের আস্ফালন নিয়ে?'
পরিপুষ্ট শূকরীর মত সঙ্গিনীর
নগ্ন প্রায় দেহের ভাঁজগুলিতে আলস্য ও ক্লান্তিতে
চোখ বুলিয়ে রিসিভার ধরল
আর কাদের যেন তীক্ষ্ণ কণ্ঠে গালি গালাজ করল।

কিছুক্ষণ পর ডাষ্টবিনের উপর ঝগড়ারত
কঙ্কালসার কুকুরগুলির ঘেউ ঘেউ রব স্তব্ধ হ'ল।
পাড়ার প্রভুহীন বিড়ালগুলোর আওয়াজও বন্ধ হল।
রাজ পথে দেখি হাতকড়ি পড়া কঙ্কালের মিছিল
ওরা কোথায় যাবে? অন্ধকার নেমে আসে,
ক্লেদাক্ত কীটগুলি কিল্ বিল্ করছে
একটা অস্বস্তি নেমে এল; ওরা কোথায় যাচ্ছে?

:—◡—:

আটত্রিশ

শেষের কথা

ঘুমাই বন্ধু নিশ্চিন্ত হয়ে, আজকের মত শুধু
দোহাই তোমার প্রশ্ন করোনা 'জীবনের মানে কি ?'
যুগান্তর হতে হেঁটেছি আমরা এই পথে ।
জীবন সূর্য্যের প্রথম সেদিন ঘুম ভেঙেছিল
সেদিন থেকে এই পরিচিত পথে হাঁটছি ।
প্রশ্ন করনা, দোহাই তোমার, জীবনটার মানে কি ?
নিদ্রার কোলে ঘুমুতে চাই, ক্লান্ত আমি ।

জীবনটা হয়ত স্বপ্ন, হয়তবা মরীচিকা, ।
এবার স্বপ্ন দেখতে দাও আমাকে,
পা দুটি ও যেন ক্লান্ত,
হাঁটতে হাঁটতে ঝরে যাওয়া ঝার পাতা
রক্ত-ঝরিয়ে, পথ মাড়িয়ে কি লাভ ?
কাহার লাভ ? কিসের লাভ ?
বন্ধু আমাকে দেখতে দাও, স্বপ্ন দেখি ।

জীবনটা'যে যুদ্ধ ? না হয় পৃথিবীটা কি একটা
অন্তহীন, আকাশছুঁয়া দালানের সিঁড়ি শুধু উঠব,
শুধু উঠব, বিশ্রাম-নাই, শান্তি নাই, অন্ত নাই,

উনচল্লিশ

অথবা ধ্বসে যাওয়া একটা ঘরের ভিত্তিতে ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন
না হয় অন্তহীন আর একটা দালানের শুরু।
কিন্তু বন্ধু প্রশ্নটিকে উচ্চারণ করনা ভুলেও
বেঁচে কি লাভ? মরেই বা কি লাভ?

সহজ হয়ে ঘুমুতে চাই, স্বপ্ন দেখব আয়েস করে,
ভালই বা কি? মন্দই বা কি?—ভাল? মন্দ?
লাটীমটা ঘুরছে, প্রচণ্ড বেগে,
তার অস্তিত্ব কোথায়? পরিচয় কোথায়?
পাগলের মত শুধু ঘুরছে আর ঘুরছে;
প্রশ্ন করোনা, দোহাই বন্ধু, কোনটা উপকারী, কোনটা না?
কেনই বা জন্ম? কেনই বা মৃত্যু?
জীবন আর মৃত্যুর পার্থক্য কোথায়?

বন্ধু! দোহাই তোমার! ঘুমুতে দাও
আর সহজ-স্বপ্ন দেখতে দাও
প্রশ্ন করনা, জীবনটার মানে কি?
ইহা হয়ত স্বপ্ন, হয়ত বা বাস্তব।
লাটীমটা ঘুরছে, জীবনটা ঘুরছে,
পৃথিবীটা ঘুরছে, জীবনটা ঘুরছে,
স্বপ্ন-বাস্তব; জীবন মৃত্যু—সব একাকার
ঘুরছে, ঘুরছে পাগলের মত শুধু ঘুরছে।

চল্লিশ

জীবনের যদি ঘুম ভাঙে, দেখব আর এক জীবন,
সে জীবনে এ জীবন স্বপ্ন না বাস্তব ?
হয়তবা স্বপ্ন হয়তবা বাস্তব।
হে জীবন, হাল্কা গানের কলিতে
আর ক্লান্ত গণিকার দেহের নেশায়
অথবা সাকীর পেয়ালায় ডুবে থাক
আর স্বপ্ন দেখ নিজের অস্তিত্বকে ভুলে
কিন্তু ভুলে ও প্রশ্ন করনা, 'জীবনটার মানে কি ?'

কেন জন্ম ? কেন মৃত্যু ?
লাটাঘটা ঘুরছে সব একাকার
ন্যায়-অন্যায়, ভাল-মন্দ সবাই এক
শুনতে চেয়োনা, জীবনের মানে কি
আর প্রশ্ন করনা মৃত্যুর অর্থ কি।



শ্রীশাগোলশেম ধবল সিংহ

বিয়াল্লিশ

ভাস্কর বিকৃতি

স্থিতির ওপার থেকে ভেসে আসে কত গান
গানগুলি গাওয়া হয় না।
ফুলরেণু গুহ—জটীল জটীল নাম
নামের ও মাহাত্ম্য কত—
বিকৃত করে বৈষম্য বিকৃতিগুলি
এপার ওপার তাণ্ডব ভাস্কর
ভিখারী কাঁদে কাঁদে আর দেখে
অর্দ্ধোন্মীলিত ভাস্কর্য্য প্রতীক
এক জোড়া নিতম্ব আর উদ্ধত স্তন
স্বপ্নগুলি নিভৃতে কথা বলে।



অদ্ভুত সমারোহ

যদি সৌখিন সমারোহ
বিস্তৃত এক অবরুদ্ধ কারার
পরস্পরে পরস্পরের প্রশ্নোত্তর খুঁজে থাক—
মিলবে এক অবিনশ্বর ভাস্য
শিল্প প্রতীক সেও এক।

যদি অন্বেষে জিজ্ঞেস করো
বিনিদ্র রজনী শেষের ছিন্তার্থী প্রাঙ্গণ
মুখোমুখী সম্প্রীতি সমারোহ
দেশজ, খণিজ যকৃত শিরার উপদাহ
আত্মকথা আক্রোশে বলে থাকে সব
হাসি রাঙা রক্তক্ষরণ

যদি মানুষ হতেম সর্বশেষে
প্রাণভরা ভালবাসা ঢেলে দিতুম
অজস্র শত্রুক্ষয়ে বিজয় নিশান
একটুকরো রক্তকরা রমণীর হাসি
আর ছলনার বুকে গেঁথে দিয়ে।

:—◡—:

চৌচল্লিশ

নেত্রপাত

কতকাল ।

অব্যক্ত ইতিবৃত্ত

হানাহানি খুনাখুনি

মানুষে মানুষে অশেষে নিষ্পেষিত;

ঘুম নেই

রোদ বৃষ্টি····অঘোরে স্বপ্নালু জাগরণ

মারো মারো; মেরে ফেলো

মেরে মেরে শেষ করে মৃত্যুবরণ

সূর্য্যরশ্মির উন্মিলিত নেত্রপাতে

এক নূতন পৃথিবী জেগে হাসবে

কেউতো বিশ্বাস ঝাড়াবেনা ।

:—◡—:

শিবির অন্ধকার

যেন একটি শিবিরে বাস করি
তুমি আমি সব
সামুনর আত্মপ্রত্যয় নিয়ে

ভুলে যেতে ইচ্ছে হয় কখনো কখনো
পরিকল্পনা প্রয়াসী মন
অতীত বর্তমান সব
মানবিক একান্ত আশ্বাসে
তোমাতে আমাতে যেমন
সম্পর্ক ঘনিয়ে আসে

এ শিবিরে এখন নীরেট অন্ধকার
তুমি তোমাকে শুধু হাত বাড়াও
আমি আমাকে তুলি হাজারো প্রশ্ন
তোমাতে আমাতে বিস্তীর্ণ ব্যবধান

কোথায় চাঁদ কোথায় তারা
ঘুলঘুলির কৃপণ কটাক্ষে ঔৎসুক্য শুধু নড়ে
উৎকীর্ণ অশেষ রজনীর প্রলাপ

ছেচল্লিশ

শুধু কানে আসে

এ শিবির অন্ধকার
তুমি আমি সব অস্তিত্ব প্রয়াসী মন
বিস্মৃত

শিবির অন্ধকার



আশ্চর্য্য

আমি ভাবি তাদেরই কথা
কেহ কেহ বা
জীবনের শেষ প্রান্তে এসে
নতুন জীবনের আশায় আলোড়িত
কতই না কষ্ট সে

পৃথিবীর বক্ষে নতুন বাতাসের আগমনে
সম্মুখে দুই পদ রেখে বৃদ্ধমহোদয়
পেছনে তাকায়
ভাবে
ফেলে আসা দিনগুলি আনন্দের নয়

আমি ভাবি তাদেরই কথা
উৎফুল্ল যৌবনে তরঙ্গায়িতা যুবতী নারীর
বঙ্ক স্মিত হাসির অন্তরালে
অব্যক্ত ভাষায় প্রকাশিত হৃদয় বার্ত্তায়
অবিরাম অঙ্কুরিত হইতে থাকে দৃষ্টির সম্মুখে
নতুন প্রাণীর আগমনের মনোরম অনুরনন
পৃথিবী সুন্দরতর হয়ে ওঠে।

আটচল্লিশ

না, আমি না ভেবে পারি না পুনরায়
স্বামী সম্পর্ক ছিন্ন করে যুবতী বধূ
আচম্বিতে পথপ্রান্তে স্বামীকে দেখে আজ
ঘৃনা রাগে অবনত মুখে পুনরায়
মুহু-র্মুহু দেখে নিতে ইচ্ছে হয়।

না, না আমি তাদের কথা না ভেবে পারিনা
মানুষের—জন্ম, মানুষের—মৃত্যু
জন্মে এসে মরার ইচ্ছা মরে গিয়ে বাঁচার কামনা
যে জন্মেছে তাকে মেরে ফেলার—
আর যে মরেছে—তাকে বাঁচিয়ে তোলার চেষ্টা
না এই মানুষের মানবিক প্রতিকৃতি—
আমি বুঝে উঠতে পারিনা আর
মানুষ হাসে আশ্চর্য্য
মানুষ কাঁদে আশ্চর্য্য
আমিও আশ্চর্যিত হই
আশ্চর্য্য।

:—⁐—:

ইবোপিশক্

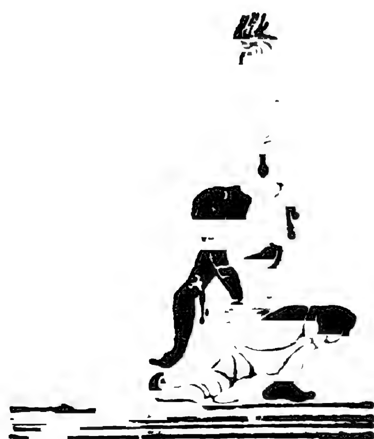
নতুন প্রাণীর আগমনে

সাত সমুদ্রের জ্ঞানে সমৃদ্ধ
সৃষ্টির সেরা হে মানুষ।
নিজেকে নিজেই সম্রাট করেছিলে সেদিন

কিন্তু হায়! একী তোমার মৃত্যু।
গলায় দড়ি দিয়ে শেষ পর্য্যন্ত মরলে যে?
সৌন্দর্য্য, শালীনতা, সে যে অবাস্তব এক কথা, তোমার কাছে
অন্ধ হয়ে গেছ যে তুমি।

ভালবাসা? সত্য? সে-ত জ্বলে গেছে
অস্তির স্তূপে, তার আগুনের শিখায়
এবং নেশার ঘোলাটে কোলাহলে'
কিছুই যে নেই সারাংশ তোমার,

শুধু শূন্যতা—আর অন্ধকার যে তুমি।
মানুষ—এই নাম আর নেই জগতে।
মরে গেছে তাদের প্রাণ অনেক আগে
বিবেকের বিকার শুধু ফিস্ ফিস্ করছে
বস্তুচাপা মানুষের অশ্রুসিক্ত আত্মার কাছে।



ফুটপাথ

সদ্য নির্ম্মিত একটি ফুটপাথ
একটি বর্ষীয়ান বকুল গাছের
কত বৎসরের আলোয় চিহ্নিত শিকড়টির উপর
হৃদয়হীন ঢালাইকার ঢেলে দিল প্রস্তর।

সোনালী রঙ এর সন্ধ্যায়
আকাশের মধুর হাসির লগ্নে
বর্ষীয়ান বকুল গাছের ফুলগুলি
বিক্ষিপ্তভাবে ঝরে পড়ে আছে
ফুটপাথটির উপর।

সন্ধ্যা ভ্রমণে আসা কামোন্মত্ত যুবক যুবতীরা
ভ্রুক্ষেপ না করেই পদাঘাত করে চলে যায়
লৌহযুক্ত চর্ম্মের পাদুকা দ্বারা।
চোখে পড়ে তাদের বকুল গাছটির ছবি
কিন্তু নিস্পৃহ দৃষ্টির নিছক দৃষ্টিপাত মাত্র
আর হাই তুলেছে এক ক্লান্তিমাখা দীর্ঘশ্বাসে।

:—◡—:

ভগ্ন মূর্তি

গতকাল রজনীতে শুনেছি এক বিকট আওয়াজ
যেন এক বিরাট মূর্তির ধ্বসে পড়ার শব্দ।
হাজার হাতুড়ির ঘায়ের আওয়াজ যেন কানে বেজেছিল।
কম্পিত ধরণীর আন্দোলন-ভারে
হাজার বছরের প্রাচীন মূর্তি
রাজর্ষি—ভাগ্যচন্দ্রের
ধ্বসে পড়ল মুকুট যাতে মস্তক থেকে স্কন্ধাবধি
খোয়াইর মস্ত বাজারের স্থবির অবস্থান থেকে।

চারিদিক থেকে দুঃস্থ জনতা
দলে দলে ছুটে দুরু দুরু বুকে
স্থির লক্ষ্য তাদের রেশনের দোকানে।
চোখের পলকে জনতার ভীড় রুদ্ধুরে করে কোলাহল
ক্লান্ত কণ্ঠের ক্ষীণ আওয়াজ “আমাকে দাও আগে”।

ক্ষুধার পীড়নে শীর্ণকায়া;
কাপড়ের অভাবে লজ্জা অবহেলিত,
এই অসহায় মূক জনতারা
প্রাচীন রাজধানীর ভগ্ন প্রাচীরের
যেন ভগ্ন হৃদয়ের—টুকরো টুকরো ইঁট।

চৌয়াল্ল

অন্যদিকে কেউ ফিরেও তাকায়নি,
উড়েনি একটি কীটও সেদিকে
বিচ্ছিন্ন মস্তক মৃত্তিকার 'পরে, পড়ে আছে
রাজর্ষি ভাগ্য চন্দ্রের।

সুদূরে দাঁড়িয়ে প্রাচীন রাজধানী, কাঙ্কিপুর,
ঘন অন্ধকারে ফ্যাকাসে কুয়াশার আড়ালে



শ্রীবীরেন

একটি কুসুমের বিলাপ

সভ্যতার অগ্রগতির সাথে সাথে রাস্তাঘাটের প্রচুর উন্নতি হচ্ছে
দেশের দীর্ঘ সড়কগুলির আমূল পরিবর্তন
স্বাধীন রাষ্ট্রের এক অভিনব পদক্ষেপ বটে।
আমাদের গৌরব সমাজের কল্যাণ ব্যবস্থায়
আমরা কতদূর এগিয়ে এসেছি এই পথ ধরে ?
যদি প্রশ্ন তুলে কোন সন্ধানী মন
আমি বলব [illegible] পাথরের কথা
আর ভুলব সেই 'পাথর চাপা ছোট্ট ফুলটির কথা।

এখন ও ছবির মত মানস নয়নে ভাসে
একটি গন্ধরাজের অকাল প্রয়াণ
চোখ মেলে দেখতে চেয়েছিল আলোর পৃথিবীকে
মৃদু পবনের স্পর্শে শিহরিত, রোমাঞ্চিত
ভীরু সেই কুমারী ফুলের জীবনের প্রতি প্রীতি
ছুঁয়েছিল আমার আমার অন্তর্যামীকে।

তারপর এল এক পাথরবাহী ট্রাক
এক অর্থহীন গোলমাল—পাথরের স্তূপ
পাথরচাপা সেই ফুলের কথা কেউ ভাবেনি।

নোংরা পোষাক পরা ছয় ফুট লম্বা
ড্রাইভারটির অট্টহাসিতে ধরা পড়ে
গত রাত্রির কুমারীর কৌমার্য্য হরণের কাহিনী,
তাহার মিশকাল দাঁতগুলি হিংস্র জন্তুর মত
মাংস ছিঁড়ে খাওয়ার সাক্ষ্য বহন করছে
এখনও তাজা রক্ত লেগে আছে সেখানে।

রাস্তার ধারে শুয়ে ছিল এক প্রভুহীন কুকুর
তাহার করুণ বিলাপ হৃদয় ছুঁয়েছিল।
কিন্তু তখনও মিশকাল ড্রাইভারটি
নিজের কৃতিত্বের কথা ভাবছে
আর অট্টহাসিতে ঢাকতে চাইছিল বুঝি
কুমারী গন্ধরাজের কান্নার করুণ শব্দ
আর ভুলতে চেয়েছিল বুঝি কুমারীর কৌমার্য্য হারানোর বিলাপ।

কুকুরটির কান্নার রোল
আর ড্রাইভারটির অট্টহাসির ত্রাস ছাড়িয়ে
যন্ত্রদানবটি গর্জ্জে উঠল
ধূলা, ডিজেলের কাল ধুম্রের মাঝে
সবুজ পৃথিবী মিশে গেল
আর কিছুই মনে পড়েনা, চোখে ভাসে না

আটাশ

শুধু আলোর পিয়াসী গঙ্গফড়িঙটির অকাল মৃত্যুর ব্যথা,
এবং কুকুরটির বিলাপ এখনও হৃদয়ে বাজছে

আবার সেই অপমৃত্যুর দৃশ্য দেখেছি
অতীব কাছে বাংলাদেশে
এবং পৃথিবীর লোকালয় চিহ্নিত
মানচিত্রের প্রত্যেকটি জায়গায়।



দাবী

জীবন নাট্যের এই রঙ্গ মঞ্চে
আমারও বক্তব্য আছে অতীব সামান্য,
কর্ণকেও দিতে হবে প্রতিযোগিতার এক
নিরঙ্কুশ সুযোগ।

অনেক দিন ধরে ঘুন ধরা প্রথাগুলি
পায়ে পায়ে চলে আসছে আমাদের জীবনে
এখনও পূর্ণমাত্রায় সম্মানিত তারা।
না—দ্রোনাচার্য্য এখন আর কৃপাচার্য্য নহে—।
মুক্তাখচিত মুকুট আর জমকাল পোষাক যদিও নাই,
কোট, টাই, পেন্ট শোভা পাচ্ছে তোমাদের দেহ,
দর্প ভরে উপভোগ কর পিতৃ সত্ত্ব—
অন্যায় ভাবে অর্জ্জিত অর্থ—।

এখন? তোমাদের কি অভিপ্রায়?
সমস্ত পৃথিবী ঘুমাক
আর নতুন করে গড়ি আর এক পৃথিবী
কর্ণ অর্জ্জুন সেখানে হবে মুক্ত প্রতিযোগী।

থাকবেনা কেহই সাহায্যকারী মুক্তরণে।
তোমরা জীবনকে দেখ মৃত অথবা ঘুমন্ত,
কিন্তু আমি দেখছি জীবন্ত জীবন

ষাট

শুধু আমার, শুধু তোমার, শুধু তাহার।
গড্ডালিকা প্রবাহে আমাদের জীবন
স্রোতে ভেসে চলে, অট্টালিকা আর সব যান বাহন
ফুলের হাসি, শিশিরে সিক্ততায়,
ভ্রমরের আশার গুঞ্জরণে, মেঘের মুক্ত ভ্রমণে.
কবির কল্পনায়, সিনেমা হলের ভীড়ে--
সর্ব্বত্র দেখি জীবনের তীব্র প্রতিযোগিতা।
হে কর্ণ ! তোমাকে পারনা ভাল দেবতারা
তুমি নিঃসঙ্গ, অসহায় জগতের মানুষ কেন।
অর্জ্জুন ! তুমি যে অপদার্থ পরগাছা,
অস্ত্র প্রতিযোগিতায় কর্ণকে দিতে হবে
এক পূর্ণ-মুক্ত অধিকার।

কিন্তু হায়। মানুষ মানুষই,
আর দেবতারা-দেবতাই—।
কিন্তু হে জাগ্রত জনতা !
দেখেছ কি দেবতা আর মানুষের,
এক হাস্যকর সমন্বয় সাধন।
আমি বুঝিনা তোমাদের শাণিত যুক্তির তর্ক,
আমি শুধু কর্ত্তব্য বুঝি এক নিরপেক্ষ জীবন।
কর্ণকেও দিতে হবে বাঁচিবার অধিকার।
স্বাধীন মুক্ত অধিকার।

—:○—:

মধুবীর

বন্দী বিহঙ্গের গান

বন্ধু ! নিজেকে দেখেছ তুমি স্মিতহাস্যে মুকুরে,
ভেবেছ নিশ্চয় ! সুন্দরতম আমি;
মুক্ত মাঠের প্রান্তরে বসে, বাতাসে ফুস্‌ফুস্‌ পূর্ণ করে
হয়ত বা ভেবেছ আয়াস করে, বেঁচে আছি আমি সুন্দর ভুবনে ।

তুমি আমি মরে গেছি অনেকদিন আগে
প্রাণ আমাদের নেই দেহে
ধমণীতে বয়না আর তাজা রক্তের ধারা
বহুবর্ষার বর্ষণভারে প্রাচীন গৃহের চালা
প্রাচীন হাড়ের সমষ্টি এই পর্ণ কুটীর
তোমার আমার এই দেহ ।

দেখ বন্ধু ! ধারাল নখাগ্র
কৃষ্ণবর্ণের রক্তচক্ষু যমরাজের এই চেলারা
ফিলিস্তিনের রক্তলোলুপ সৈন্যরা
বন্দীদের গায়ে বেয়নেট্‌ খুঁচিয়ে উল্লাসে মাতে তারা

বন্ধু ! তোমার আমার প্রাণকে নিয়ে একী খেলা !

বন্ধু ! তোমার আমার আছে কি সাহস
ছিনিয়ে নিতে নিজেদের প্রাণ, দানবের হাত থেকে ?
অথবা কোন মন্ত্র জান কি হিংসা করিতে জয় ?
প্রাণের হিসাব নাইবা রাখলাম প্রাণের পরিত্রাণে !

নেই, নেই, আজ আমাদের মাঝে সেই সতী
সত্যবানের প্রাণ ফিরে আনা
যমপুরী থেকে হাসি মুখে ফেরা, সাবিত্রী
সব মিছে হল, নেই আমাদের সেই শক্তি ।

থাক্ পড়ে থাক্ প্রাণ হীন মোদের এই দেহ,
গ্রীষ্মের এই খরতাপে যাক. পুড়ে যাক্
যতক্ষণে না হারিয়ে যায় বর্ষার পলিমাটীতে।
সব যন্ত্রণা দাবদাহের । হেরে যাবে বর্ষায় ধারায় ।
ঐ মাঠেরই ভরা ক্ষেতে, পাকা ফসলের পূর্ণতায় ।

—:◯:—

নীলকান্ত

লিংখোইখোং এর চন্দ্রসংগী

হে পৃথিবী। ইতিহাসের রাজপথে অনেক হেটেছি আমি,
হেটেছিলাম রোমনগরীর কোলাহলময় পথে
আরও দূরে আটলান্টিক মহাসাগর পার হয়েছিলাম,
এমনকি ট্রয় নগরীতেও বিশ্রাম নিয়েছিলাম হেলেনের সাথে
তারপর কৌব্রু পর্ব্বত শিখরে দাড়িয়ে
অতীত ইতিহাসের মণিপুরকেও দেখেছিলাম।

পাখংবা গুরুর বন্দনা করেছি
কিয়াম্বা রাজের রাজসভায়ও শ্রোতা হয়েছিলাম
সন্ধ্যার আলোয় রাজকুমারী লুখোই এর সাথে বেরিয়েছিলাম
নাচের আসরে হাত ধরেছিলাম কুমারী লাইরোবীর
আর তার কানে কানে বলেছিলাম, 'কেমন আছ ?'

ক্লান্ত দেহ, প্রাচীন মন, চোখের স্তিমিত আলো,
তবু ও আচম্বিতে ঘূর্ণি ঝড়ের মত বারুণী পর্ব্বত 'পরে
সারি সারি পর্ব্বতের আলোয়
তাজমহলের শুভ্র আননে
কৌব্রু পর্ব্বতের অন্ধকারের মত কাল তার বিক্ষিপ্ত কেশে
চীংখৈ দেবীর মদির হাসিতে

ছন্দঘটা

আমার পাশে এসে বসলো নিংথৌএর চন্দ্রসখী।
আমাকে প্রশ্ন করেছিল, 'চিনতে পারলেন ?'
যাহাকে ভেবেছিলাম অনেক কল্পনার ভাষায়
কিন্তু দেখিনি বাস্তব নয়নে কভু
আমাকে ভুলেনি তবুও সাক্ষাৎ ঘটেনি
এমনি এক রহস্যময়ী প্রিয়ার মত
জীবনের কর্ম্ম অবসরে, হিসাব নিক'শের শেষে
গহনরাতের প্রদীপ শিখায় একান্তে
কাছে এসেছিল জগতের আকুলতা ঢেলে
আমাকে ভাবিয়েছিল নিংথৌএর চন্দ্রসখী।

এতদিন বিশ্বাস ছিল, বিদগ্ধ পণ্ডিত আমি,
দেশভক্ত, তার্কিক, কর্ম্মী ও কবি
আমার বুদ্ধির কুয়াশা ভেদ করে
কোন জ্ঞানী ও সাহস করেনি আমাকে হারাতে।
জীবনটাকে ভেবেছিলাম সত্য ও সুন্দরের
এক সহজ খেলার মাঠ—
তবুও আমাকে বিস্ময় করল
হ্রদের কল্কিফুলের মত রঙীন পোষাকে
কোকতার মৃদু মলয়ার ছন্দে
সবুজ মাঠের সবুজ ধান্যের মত বাহুলতায়
ভুমুর দিগন্ত পানে বাজান খাম্বার বাঁশীর সুরে

আমার কাঁধে হাত রেখেছিল
আমাকে তাকিয়েছিল নয়নে নয়ন রেখে
নিংথৌখং-এর চন্দ্রসখী।

সখী! কোন মাহেন্দ্রক্ষণে তোমাকে দেখেছিলাম কদমতলায়
জীবনের অর্থ কি? ক্ষাক্ত কাংব'র।
ভালবাসার মানে কি? মিথ্যা মায়া?
মুহূর্ত্তও অবকাশ নাই ঝরে পড়া মল্লিকার দিকে তাকাবার
প্রভাতের ঝরা বকুল পড়েনি মাথার উপর পুষ্পবৃষ্টিসম
তথাপিও গহনরাতে, অন্ধকার আকাশের নীচে,
নম্বোল নদীর কমণীয় ও ললিত ছন্দে
কাছে এসেছিল প্রদীপ শিখার মত উজ্জ্বল দৃষ্টিতে
অশরীরী আত্মার পাখার শব্দে
সমস্ত শরীরের লোম দাঁড় করিয়ে
কোকিলের কণ্ঠকে পরাজিত করে
ক্ষণিক জড়িয়েছিল আমাকে নিংথৌখং-এর চন্দ্রসখী।



চল আমরা দু'জনা কোথাও

চল, আমরা দু'জনে কোথাও যাই কোথাও
জ্যোৎস্না সমুদ্রের উপর যেখানে কোন নাবিক পৌঁছতে পারেনা
কেহই দেখবেনা, শুনবেনা, জানবেনা—
শুধু চল, শুধু চল, প্রশ্ন করনা—কেন ?
ধ্বজ-ধৃত কালের প্রতিজ্ঞা একই বৃন্তের দু'টি ফুল
আমার নহে, আমার নহে।
আমার ভালবাসা যে গুপ্তচর
মহাদেবের সম্মুখে পরাজিত পলায়নরত কামদেব
হস্তীপদে জড়িত খাম্বার অবয়ব।
দুষ্মন্তের সভায় মুখ আচ্ছাদিত দণ্ডায়মান শকুন্তলা।
জানি হে জানি, সেদিন তুমি
আমার বস্ত্র ধরে টেনে রেখ নাই,
হতে পারিনি তোমার ঘোড়শওয়ার যুবক,
বলি নাই কোন কিছু, তোমার স্বপ্নিল সান্নিধ্যে,
করি নাই কোন এক অর্থপূর্ণ ইঙ্গিত
লোক্তাক হ্রদের তীরে থমংখালের মুখে।
প্রিয়তমে তুমি জান নিশ্চয়, আমার হৃদয়ের ভাষা,
শুনেছ নিশ্চয় তুমি ফুলের আর্তনাদ, বসন্তের বিলাপ ধ্বনি,
দেখেছত কুয়াশায় ঢাকা শরতের পূর্ণিমাকে
এসো প্রিয়া, কাছে আমার, ধর হাত সানন্দে
হায়! কেন সরে যাও প্রিয়া ?

তোমার কৃষ্ণকেশের লাবণ্য দেখছি কি বারবার
ত্রিভুবন ভুলানো তোমার কেশের কান্তিতে
ঢেকে দাও আমাকে প্রিয়তম:— অন্ধ করে দাও আমাকে।
দেখেছ কি হাতের ফুলটিকে?
ধরতে যদি না চাও, কাছে এসো, খোঁপায় গুঁজে দেই।
তুমিত জাননা প্রিয়া,
কেন অশ্রুঝরায় শরতের জ্যোৎস্না
কেন আতঙ্কিত হই ঝরে যাওয়া বসন্তের মালিকা দেখে?
কেন বেদনায় ভারাক্রান্ত হই কাল মেঘ দেখে, আকাশে
তুমি দেখবেনা, তুমি শুনবেনা আমার সুর হারানো গান
অপ্রকাশিত পদক্ষেপ, অবিচ্ছেদ্য ধ্রুবতারার ছন্দ।
জবাবহীন অনন্ত প্রশ্নের মরুবালুকার কান্না
সেও তুমি জানবেনা, শুনবেনা।
কিন্তু তুমি চেয়ে আছ অপলক দৃষ্টিতে
শূন্য আকাশের নীলিমায়, শূন্য আকাশের পানে।
দেখবে কি তুমি একটবারের মত—,
আমার ক্লান্ত দৃষ্টিকে, আলোকহীন মুখোচ্ছবিটিকে
জ্যোৎস্না সমুদ্রের তরঙ্গে চল আমরা কোথাও
ভেসে যাই, একান্তে দুজনায়—।
প্রশ্ন করনা কেন? কোথায়?
শুধু ভেসে যাই সেখানে কোন নাবিক পৌঁছতে পারেনা
কেউ শুনবেনা, কেউ দেখবেনা. কেউ জানবেনা।

—:—:—

শৌগাইজম ব্রজেশ্বর সিংহ

আলোর অভাবে

অদূরের হাইকোর্টের গম্বুজে
আমাদের ধ্বজাটি উড়ছে।
ঘরের ভিতর বিছানো শয্যাগুলি
এলোমেলো। শ্মশানের ধুয়াগুলিকে
ভীত সন্ত্রস্তে প্রণাম জানাই।

কেপিলজের চারতলায় সেই দৃশ্যপটে
বাঁধানো সিঁড়ির অন্ধকার পথে
বিবসনা রমণী আমার হাত ধরে বলল,
চল এই অন্ধকার কক্ষে,
সাথে সাথে ঘরের ভিতর এলোমেলো শয্যাগুলি
নেচে উঠল।

একটু নেমে যাই,
নেমে গিয়ে দেখি—
গলাকাটা সবুজ ঘাসগুলি
আকাশের দিকে পিঠ করে শুয়ে আছে,
বুকে হাত রেখে, অন্য হাত ইঙ্গিত করছে কাহার পানে
তারা যে শুধু তার মৃত্যুর কারণ।

বাহাত্তর

বড অন্ধকার মনে হয়—ষ্টেশনের এই ধারটুকু
লাশকাটা লাইনের ধারে, চলে অবিরাম গুডস্ ট্রেইন
ছেড়ে চলে যায়, এই ষ্টেশন।
ওপাশে যাত্রীরা টিকেট কিনছে,
আর ভাবছে ট্রেইনের উপরে উঠে
স্নেহাস্পদ স্বজন পরিজনের কথা,
ছিন্ন বিচ্ছিন্ন শব্দের টুকরো টুকরো কান্না
সেই অন্ধকারে কারা যেন বলছে
বুক নেই
কাহারও নিতম্ব
আবার কাহারও নেই হাত।

সব অন্ধকার ভেদ করে ভেসে আসে
এক ক্ষীণ আওয়াজ
বি এয়োয়ার অব পিক্ পকেট।
ট্রেনের ধুলি মাখা ধূসর দেওয়ালে
সেই সব লেখাগুলিকেও আলোর অভাবে
আর পড়া গেল না।

আমার [illegible]

ইতিহাসের যাত্রাপথে, পৃথিবীর বহুস্থানে গিয়েছিলাম।
বুকের রক্ত দিয়ে ও প্রাণ দিতে চেয়েছিলাম
মুমূর্ষু স্বাধীনতাকে পলাশীর প্রান্তরে।
ভগ্নহৃদয় নবাব সিরাজ উদ্দৌল্লার
মুক্তাখচিত সেই মুকুট ধূলি লাঞ্ছিত হয়েছিল
পলাশীর আম্রকাননে লোকচক্ষুর অন্তরালে।
দেখবি যদি আর নবাবের কম্পিত ছায়া,
সেদিন শিশির বিন্দুপাতের শব্দ ছিলনা,
শুধু শুকনো পাতার মর্মর ধ্বনি যেন
অস্ত্রের ঝন্ ঝনের মত আম্রকাননের স্তব্ধতা ভেঙেছিল।
ইতিহাস তোমার অভিপ্রায় সিদ্ধ হ'ল।
স্বাধীনতার মোহনায় ইংরেজ বদ্বীপে
ভারতীয় দু'টি ধারা ভারত ও পাকিস্তান
হারাল কালের মহাসমুদ্রে খণ্ডিত হয়ে।

[২]

কত জায়গায় গিয়েছি—চলার [illegible]
হিমালয়ের পাদদেশ থেকে কন্যাকুমারী।
দেখেছি শাহজাহানহীন কত নিঃস্ব তাজমহল
দেখেছি প্রেমের মৃত্যু শৈত্যের প্রলয়ে
দেখেছি ডাকাতের দল স্নেহের লুটতরাজ
তাই তারা দাঁড়াতে পারেনি মর্মর তাজের সমাধি ছায়ায়

[৩]

জ্যোৎস্না প্লাবিত রজনীর নির্জনতায়
সবুজ ঘাসের উপর হেটে হ আমি একা
ইতিহাসের গতিপথে সুমেরু থেকে কুমেরু পর্যন্ত।
সম্মুখে দেখেছি আমি রক্তের স্রোত
দেখেছি অশ্রুস্নাত বিধবা অনেক
প্রিয়জন বিচ্ছেদের সেই অশ্রু জাহ্নবীতে
আমার তীর্থ ভূমি বৌদ্ধগয়া
আমার মুক্তির স্থান চলার শেষ।

:—:

তোমার সান্নিধ্য

তুমি যদি দুয়ার খুলো
আমাকে ডেকো কিন্তু।
আমি ও বাহির হব
দুয়ার খুলে সানন্দে
তোমার সান্নিধ্য লাভের জন্য।
কিন্তু তোমার সান্নিধ্যের পূর্ব্বে
মিশে যাব আমি
এ দেশেরই মাটির সাথে
তোমার পদধ্বনি শুনার জন্য
আর দেখব মাটির গন্ধ আছে কি ?
যদি কোন প্রতিবাদ না থাকে মাটির,
না হয়, তোমার সাথে হাটব পাশাপাশি।
কোন দ্বিধা থাকবেনা সাথে।

জীবন

এই মৃদঙ্গের তালে আমি ও নাচতে পারি
তার পর সম্মান ?   সেত এক সহজ প্রশ্ন ।
নতুন স্কুটারে চাপতেই আমার প্রাচীন মনটাও
যেন নতুন ফাগুনের আগুনে ভন্ ভন্ ঘুরছে
আর নিমিষেই উধাও হ'ল দিশেহারা ।
কিন্তু এইটুকু বলেছিল ;   জীবনের গন্ধ আছে এখানেও
তবু ও প্রশ্নটির জবাবের জন্য ফিরে ও তাকায়নি ।
এই বাজারের কোলাহলে আমি ও শিস্ দিতে পারি ।
বেচা কেনা ?   মস্ত জনতার চোখে পা রেখে
আমি ও হাঁকতে পারি দাম কত ?
মন্ডপ শিল্পিটিকে নিয়ে যেতে পারি, যেথা খুশী
গ্রামের পথে পার্লামেন্টে রাজধানীতে
যদি বিহঙ্গটি মুখ তুলে না জানায় পালকের কথা ।
প্রশ্নটির উত্তর না দিয়ে, উত্তপ্ত পেটটা ঠেলে বলল,
ডমটা খারাপ, বিকৃত মুখে ।

—: :—

নিজ পরিবর্তনেও

জানিনা কত বিনিদ্র রজনীর সাধনার ফলে
বিধাতার অপূর্ব্ব পরামর্শে
জরাসন্ধ পুরুষটাকে স্ত্রী জরাসন্ধ করল,
একটি ক্ষুদ্র আশার পরবশ হয়ে ।

কিন্তু হায়! সহস্র প্রেমিক তার
বন্যার বেগে ছুটে এল চারিদিক থেকে;
আর প্রতিযোগিতায় মত্ত হয়ে
চুম্বনের পর চুম্বন এঁকে দিল প্রিয়াকে ॥
মানুষের পরম প্রভুর বিরক্তির ভ্রূকুটী রেখা,
ফুটে উঠে গম্ভীর ললাটে ঝড়ের পূর্ব্বাহ্ন যেন
তারপর দুটি পায়ে ধরে পরম ক্রোধে
দ্বিখণ্ডিত করল জরায়ুর অবয়বটীকে
কিন্তু হায়। তার দিক জননেন্দ্রিয়ের কোন পরিবর্তন ঘটেনি
তারপর তার সহস্র প্রেমিকের
ভালবাসার উপহার স্বরূপ
বেরিয়ে এল সহস্র জরাসন্ধ সন্তান।
এই অপূর্ব্ব পরিস্থিতির উৎস স্ত্রী জরাসন্ধ
বিদ্রূপের সরব হাসিতে বলল,
বিধাতা কেমন লাগল, তোমার এ ব্যর্থতায় ?

—::—



